উন্নত মানবসম্পদ গড়ে তুলবে যে শিক্ষাব্যবস্থা

যে অনন্য বৈশিষ্ট্য মানুষ জাতিকে অন্য কোনো প্রাণি থেকে পৃথক করেছে এবং শ্রেষ্টত্ব দিয়েছে তা হচ্ছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমাত/জ্ঞান-বিজ্ঞান)। এই জ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিকাশ, সমৃদ্ধি ও উন্মেষ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। দেশে মানুষের মতো মানুষ অর্থাৎ মানবসম্পদ গড়তে জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। এই শিক্ষা সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা– দুই-ই হতে হবে। সামাজিক শিক্ষা সমাজের সাধারণ মানুষের উপাানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যার উপর ভিত্তি করে সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষা মানুষের মানসিকতার উন্নয়ন, আদর্শ সমাজ গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার উন্নতি একটা জাতিকে উন্নতির শিখরে বয়ে নিয়ে যায়। কার্যত আমাদের দেশে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়াতে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে সমাজ আজ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশিষ্ট পরিবেশে রূপ নিয়েছে। আমরা এই দুর্বিনীত অভিঘাত-জর্জরিত সমাজের উত্তরাধিকার হয়েছি।

শিক্ষা বলতে আমি লেখা, পড়া ও অংক জানা লোকদেরকে বুঝিনে। শিক্ষিত লোকের মধ্যে এ তিনটি উপাদান ছাড়াও আরো কয়েকটা উপাদান বা গুণ থাকতে হবে। এর মধ্যে সবার আগে ধর্মীয় মূল্যবোধ একটা। শিক্ষার ভিত্তিমূলে ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকা অবশ্যম্ভাবী। ধর্মীয় মূল্যবোধ অন্তর্নিহিতভাবে প্রতিটা মানুষের (হোক আস্তিক, হোক নাস্তিক) কাজে-কর্মে, চিন্তা-চেতনায় সুস্থ মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে ভালো পথে চলার ও মায়া-মমতা দিয়ে পরিবার নিয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার সুবিধা দিয়ে আসছে। ধর্ম জনসম্পদের বুনিয়াদ সৃষ্টির একটা মূল উপাদান। তাই শিক্ষাকে ধর্মচ্যুত করার কোনো অবকাশ নেই। যে শিক্ষায় সততা ও আদর্শ নেই, নৈতিকতা নেই– সে শিক্ষা মূল্যহীন। সেজন্য সেক্যিউলারিজম (নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়– এই মতবাদ) তত্ত্বকে বাদ দিয়ে শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে হবে। গবেষণা বা অনুসন্ধানও শিক্ষার অন্যতম উপাদান ও গুণ। গবেষণাহীন বা অনুসন্ধানবিহীন শিক্ষা হাজা-মজা, নিশ্চল এক জলরাশি। শিক্ষা নিতে গেলে শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটায়। তারপরই শিক্ষা পূর্ণতা পায়। তাই শিক্ষায় গভীরভাবে ভাবতে শেখা আনতে হবে। আরো যে দুটো উপাদান বা গুণ শিক্ষায় থাকতে হবে, তা হলো– জাগ্রত বিবেক ও মূল্যবোধ এবং ন্যায়নিষ্ঠা। শিক্ষায় মানুষের অন্তর্নিহিত বিবেকবোধকে জাগিয়ে তুলতে না পারলে সে শিক্ষা নিষ্ফলা ন্যাড়া ক্ষেতের সমান। ন্যয়নিষ্ঠা হলো ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, স্বচ্ছতা, সত্যের প্রতি আনুগত্য, অহিংসা, দেশপ্রেম, মিথ্যা-শঠতা-চৌর্যবৃত্তিহীনতা প্রভৃতি। এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণের মাত্রা যার মধ্যে যত বিসারিত হবে, সে তত শিক্ষিত। এই শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য অনেক বেশি। আমার মতে, এদেশের মানবসম্পদ গঠনে একজন মানুষের মধ্যে শিক্ষায় তিনটি অপরিহার্য গুণগত বিশেষত্ব থাকতে হবে: ১. জীবনমুখী শিক্ষা– শিক্ষা জীবনের ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা তৈরি করবে, সমাজ ও পরিবেশকে বুঝতে, সাধারণ কাজ শিখতে ও সেমতো চলতে শেখাবে, বাস্তবধর্মী সাধারণ জ্ঞান দেবে, ভাবনা-চিন্তার গভীরতা দেবে ইত্যাদি। ২. কর্মমুখী শিক্ষা– শিক্ষা মানুষের কোনো না কোনো কাজ বা পেশায় বিশেষত্ব আনবে, কর্মে সৃষ্টিশীলতার জন্ম দেবে, লুকায়িত প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে ইত্যাদি। ৩. মানবিক গুণাবলী-জাগানিয়া শিক্ষা– সততা, জাগ্রত বিবেক, ধর্ম-অহিংসা, দেশপ্রেম, সৃষ্ট জীবের প্রতি সহমর্মীতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি। এই তিনটা বিশেষত্ব একটা মানুষের মধ্যে থাকলে তাকে মানবসম্পদ বলবো। এ মানবসম্পদ তার নিজের, সমাজের ও দেশের সম্পদ হিসাবে কাজ করবে। সমাজ, দেশ ও জাতি গড়তে গেলে অনেক কিছুকেই মগজে ঠাঁই দিতে হয়। আদর্শ সমাজ গড়তে গেলে অসংখ্য দিক-নির্দেশক ফ্যাক্টরকে বিবেচনায় আনতে হয়, ভাবতে হয়। পরিকল্পিতভাবে সমাজ গড়তে হয়। সেমতো পরিকল্পিতভাবে জাতিকে সামনে এগিয়ে নিতে হয়। তারপর উন্নত দেশ ও দিপ্তিমান জাতি গড়ে ওঠে। সে জাতির আলোকপ্রভা দিনে দিনে বিশ্বের সকল শ্রেণির সকল মানুষের চেতনার গহন কন্দরে ছড়িয়ে পড়ে।

এসব করতে গেলে একদল সমভাবাপন্ন সুশিক্ষিত দূরদর্শী পরিচালক লাগে। তারপর দেশ ও জাতির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। সুনির্দিষ্ট আদর্শের বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ উদারনৈতিক সামাজিক মূল্যবোধ, পুঁজিবাদ ও সেক্যিউলারিজম থেকে ক্রমশ সরে আসতে হয়। দেশীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, দীনি-নন্‌দীনি নির্বিশেষে সামুদয়িক শিক্ষা ও অহিংস ধর্মপালনের চর্চা করতে হয়। অভাবী-দুঃস্থ-অসহায় মানুষকে রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ সহায়তায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের একটা বড় অঙ্কের ভাগ দিতে হয়। এটা রাষ্ট্রের দয়া না, এটা তাদের অধিকার। দেশের ধর্মগুরুদের সৃষ্টি-উদাসী বেহেশত যাবার সটান (শর্ট-কাট) তরিকা বদল করে কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে সৃষ্টিসেবার দিকে মন দেবার জন্য আহ্বান জানাতে হয়। একটা টেকসই ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলকে গ্রহণ করতে হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এদেশের বড় সমস্যা। সিস্টেম-লস কথাটা অভিধান থেকে উঠিয়ে দেয়াটাই ভালো। দৃঢ়-শক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। দেশব্যবস্থায় মিথ্যাবাদী, অজ্ঞ, মুর্খ, সোস্যাল টাউট, মোসাহেব, লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধানদেরকে বাদ দিয়ে ন্যায় ও সত্যের অগ্রপথিক, সুস্থ-সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হয়। তখন রাষ্ট্রের নাম হয় কল্যাণ রাষ্ট্র।

এসব কথা একটু বেশি বলতে গেলেই সেই প্রথমে বলা জনগোষ্ঠীর মানসিকার উন্নয়নের প্রসঙ্গ চলে আসে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের পাঁচটি সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বাত্মক ব্যবহার প্রয়োজন– মানুষ, আহরিত ও উৎপাদিত মালামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি, এবং অর্থসম্পদ। এগুলোর মধ্যে মালামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি এবং অর্থসম্পদ নিষ্প্রাণ, অচেতন ও জড় সম্পদ। একমাত্র মানুষই জীবন্ত ও সজীব সম্পদ। অচেতন ও জড় সম্পদ নিজে নিজে কিছু করতে পারে না, সে সক্ষমতাও তাদের নেই। উন্নতি নির্ভর করে এই জীবন্ত সম্পদ দিয়ে কিভাবে অচেতন ও জড় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তার উপর। জীবন্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ও দক্ষ ব্যবহার আবার নির্ভর করে বসবাসরত মানুষের দক্ষতা, মানসম্মত যোগ্যতা, পরিবেশ, জীবন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ও মনোভাব এবং মানবিক চরিত্রের উপর। একটা দেশে অঢেল সম্পদ থাকলেও সুযোগ্য ও যথার্থ ব্যবহারের অভাবে জনগোষ্ঠী দুর্দশাগ্রস্ত, অনুন্নত ও মানব জাতির কলঙ্ক হতে পারে। অচেতন ও জড় সম্পদ সৎ বা দর্নীতিবাজ হতে পারে না। মানুষ তথা জনগোষ্ঠী 'জন-আপদ' বা 'জনসম্পদ' হতে পারে। ব্যতিক্রম বাদে জন-আপদ হয়ে কেউ জন্মাই না; আমরা নিজেরা সিস্টেম করে জন-আপদ গড়ে তুলি। জনগোষ্ঠী জন-আপদ হলে রাষ্ট্রীয় সুশাসন, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুযোগ্য জাতিগঠন দুর্বৃত্ত দুঃশাসন, দুর্বিনীত দুরাচার ও দুশ্ছেদ্য দুর্গ্রহে রূপ নেয়। সমাজ ও দেশের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অমানবিক কার্যকলাপ যারপরনাই বৃদ্ধি পায়। দেশের যাবতীয় সম্পদ প্রকাশ্যে লুটপাট করে কোনো এক গোষ্ঠী পকেটে ভরে। দেশের অসচেতন সাধারণ মানুষ এজন্য অজ্ঞতাবশত অদৃষ্টকে দোষারোপ করে, বুক চাপড়ে শান্ত্বনা খঁজতে থাকে। কিছুই করার থাকে না। এসবই জন-আপদ তৈরির পরিণাম। এটা একটা 'ভিশাস সার্কেল'। আমরা এই 'ভিশাস সার্কেল'-এ (দুষ্ট আবর্তে) পড়ে গেছি। বেরিয়ে আসাটা অতটা সহজ নয়। এই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া যে যত কথাই কোরাস ধরে বলুক, প্রকৃত মুক্তি নেই। এজন্য সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে, জীবনমান উন্নয়নে এবং দেশের উন্নয়নে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন ও মানসম্মত দক্ষতা ও সুশিক্ষা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুষ্ট আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার সূচনা হিসেবে কোথাও না কোথাও থেকে শুরু তো একবার করতেই হয়। তাই পরিত্রাণের পথ খুঁজতে:

- সমাজের প্রতিটা মানুষের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যষ্টিক (জনে জনে) উন্নয়নের একটা টেকসই ভিত্তি তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।
- সাধারণ মানুষের মানসিকতা ও জীবনমান উন্নয়নমুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফটস্কিল্‌স ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন ।
- স্বাস্থ্য সেবা, দরিদ্র-দুঃস্থ-অসহায় মানুষকে দান এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধিতে সক্ষম সম্পদ গড়তে সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন ।

- ছাত্রছাত্রীদের ব্যবসায়, কারিগরি ও বিজ্ঞানমুখী আধুনিক শিক্ষার সম্মিলনে সমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দেশপ্রেম প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী তাদের মনে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।
- সেই সাথে ছাত্রছাত্রীদের এবং যুবসমাজের বহুমুখী কারিগরি জ্ঞান, জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন ।

শুরুটা জনগোষ্ঠীর সুশিক্ষা, মানসিকতার উন্নয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা দিয়ে করা দরকার। কোনো কাজ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে করা যায় না। এজন্য সমাজের অভ্যন্তর থেকে জনসম্পদ খুঁজে বের করা দরকার। একটা শিক্ষা-সমাজ (একদল লোক) দরকার, রাজনীতিমুক্ত সামাজিক সংগঠন দরকার। এই শিক্ষা-সমাজ দেশব্যাপী তৈরি করা দরকার। এই শিক্ষা-সমাজ সুশিক্ষার আদর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসেবা তথা মানসম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত করবে ও সমাজে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার সাথে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণও থাকবে। আমাদের সমাজে গরিব, অসহায়, আর্ত-পীড়িত, খেটে-খাওয়া মানুষের টিকে থাকার জন্য, মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য স্বাস্থ্য-সেবা ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করবে। জীবনমান উন্নয়নমুখী শিক্ষা, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সফটস্কিল্‌স ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেবে।

সমাজের সুশিক্ষিত সচেতন জনগোষ্ঠী একটা সামাজিক শক্তি। সকল মানুষের সাথে সমাজেই তাদের বসবাস। সমাজে কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন, ভালো-মন্দ তাদের জানা। সমাজের শিক্ষা ও সেবার কাজের জন্য তাদেরকে খুঁজে বের করে আনতে হবে। তাদের কাজ করার পরিবেশ দিতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারাই এটা পারে। তাদেরকে শিক্ষা-সেবার সমাজহিতৈষী লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে দলবদ্ধ (গ্রুপ) হতে হবে। এরা সমাজের এক-একটা ওয়ার্ক-গ্রুপ। এই গ্রুপ স্ব-শাসিত ও স্বেচ্ছাসেবী হবে। এই গ্রুপের নাম হবে শিক্ষা-সেবা সমাজ। এরা কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করবে না; অর্থসম্পদ আত্মস্যাৎ করবে না। নিজ স্বার্থের জন্য রাজনীতির লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করবে না। তারা 'সুশিক্ষাই জীবন ও সমাজের উন্নতি'– এ-কথার মর্মবাণী জনে জনে মানুষকে বোঝাবে। তারা সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান উন্নীত করবে, সামাজিক শিক্ষা দেবে; সুশিক্ষিত, সচেতন জনগোষ্ঠী তৈরি করবে ও সমাজ সেবা দেবে। এতে সমাজে বসবাসরত মানুষের মন-মানসিকতার উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। মন-মানসিকতার উন্নতির ফলে উন্নতি হবে আর্থিক অবস্থারও। সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। জনে জনে সরাসরি নীড-বেইস্‌ড আর্থিক সহায়তা দেবে, যেখানে অর্থের সিস্টেম-লস হবে না। ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কাজ করবে। মানুষ ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। সময়ের ব্যবধানে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী জায়গা করে নেবে। সমাজ ও দেশ থেকে ক্রমশই দুর্নীতি, দুঃশাসন, অব্যবস্থাপনা দূর হবে। প্রথম কয়েক বছরের পর ক্রমবর্ধমান উন্নতির কারণে পরবর্তী সময়ে দ্রুততার সাথে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। এখানে কোনো নেতৃত্বের ক্ষমতা থাকবে না। থাকবে জনসেবার ক্ষমতা। সমাজসেবকরা সমাজের সেবামূলক কাজ করার কারণে সমাজের মানুষের ভক্তি ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পাবে। যে যত বড় জনসেবক সে-ই তত বড় নেতা। ত্যাগের মহিমাই এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়। এটাকে সামাজিক রেওয়াজে একবার পরিণত করে দিতে পারলেই সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিণত হবে। মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা আবার ফিরে আসবে।

(৭ অক্টোবর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।